# বাংলার নবজাগরণ,  ডিরোজিও এবং.....

আ.ফ.ম.  ইকবাল

০৮ এপ্রিল ২০২১

*লেখকের এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আসাম গার্ডিয়ান, জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যাতে ...*

নবজাগরণ বলতে সাধারণত সেই সকল পরিবর্তনকে বুঝায়, যা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে এক অনন্য আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। আসলে নবজাগরণ হলো একটি বিশৃংখলা পরিবর্তনের যুগ। সেটি মূলত ছিল এক ব্যাপক অধিকার লাভের এবং রাজনৈতিক আদর্শ পূরণের কামনা। সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের সমন্বয়ে।

নবজাগরণ মনুষ্য সমাজের অবস্থানকে সাম্মানিক ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিতই শুধু করেনি, বরং মানুষের মনে জাগিয়েছিল মানবতা ও জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা। মানবসভ্যতা নতুন করে পা রেখেছিল আলোক বা জ্ঞানের পথে- অজ্ঞতার আঁধার থেকে বেরিয়ে।

মধ্যযুগের ইউরোপ ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একান্তই করতলগত। সেই সাথে চার্চের প্রভাব ছিল সীমাহীন। ইউরোপের মানুষ চার্চের নির্দেশনা সমূহকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতো এবং তা গ্রহণ করতো নির্দ্বিধায়। নবজাগরণ বা রেনেসাঁই ছিল প্রথম প্রচন্ড ঢেউ, যা সুনামির মতো ছড়িয়ে ইউরোপের সমাজকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে আধুনিকতার পথে পা বাড়াতে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের ইউরোপের বুকে নবজাগরণ যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলো, ভারতবর্ষে তার প্রভাব পড়তে পড়তে লেগে যায় আরও কয়েক শতাব্দীকাল। এবং হ্যাঁ, এদেশে নবজাগরণের পথ দেখিয়েছিল অবিভক্ত ভারতের বঙ্গদেশ।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। এর প্রভাবে ভারতে বিশেষ করে, বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক অগ্রগতি শুরু হয়। উনবিংশ শতকের প্রথম পর্যায়ে প্রারম্ভ হওয়া অগ্রগতির এই যাত্রা বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বাংলার এই অগ্রগতির ধারাকে সমাজবিজ্ঞানীরা 'বাংলার নবজাগরণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(C) Ishan Kotha

অনেক সমাজবিজ্ঞানী তথা আধুনিক পন্ডিতের মতে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রারম্ভ হওয়া বাংলায় বুদ্ধিবৃত্তিক জনজাগরণই হলো ভারতীয় নবজাগরণের প্রথম ধাপ। যা অব্যাহত ছিল গোটা শতাব্দী ধরে। এবং মোটামুটিভাবে তা সমৃদ্ধ হয় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে। ব্রিটিশ শাসনকালের বৃহদাংশ জুড়েই দেশের রাজধানী ছিল কলকাতা। তাই স্বাভাবিকভাবে কলকাতা বা বাঙলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ- ইউরোপীয় ধারায়। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবনে ও বিশ্বাসে পরিলক্ষিত হয় এক অদ্ভুত পরিবর্তন। তাদের মননে জাগ্রত হয় নানা বিষয়ে অনুসন্ধিতসা। তারা প্রশ্ন তুলতে, প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে। প্রারম্ভ হয় বিভিন্ন প্রতিবাদমূলক আন্দোলন। গঠিত হয় নানা সংগঠন, সমিতি, সংস্কার কার্যক্রম ইত্যাদি।

বাংলার নবজাগরণের মূল ধারা প্রারম্ভ হয় রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে। এবং তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- এর মধ্য দিয়ে। যদিও পরবর্তী সময়ে বহু মনীষী এই সৃজনশীলতার জোয়ার কে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

বাংলার নবজাগরণের অন্যতম এক পথিকৃৎ ছিলেন ডিরোজিও। পুরো নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল কলকাতার মৌলালিতে এক ইউরেশীয় পরিবারে জন্ম হয় ডিরোজিওর। ডিরোজিও ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষক, সম্পাদক এবং সর্বোপরি আলোকিত সমাজের নেতা ও প্রদর্শক। তিনি ছিলেন বাংলার সর্বকনিষ্ঠ কলেজশিক্ষক। (মাত্র সতেরো বছর বয়সে)। সেইসাথে বরখাস্ত হওয়া প্রথম শিক্ষক। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মাত্র বাইশ বছরের জীবনে ডিরোজিও বাঙলার বুকে যে জনজাগরণের আলোর ছটা প্রজ্বলিত করে গিয়েছিলেন, দাবানল হয়ে তা ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দেশে, বৃহত্তর উপমহাদেশে। যদিও পরিণামে তাঁর জুটেছিল অনেক অপমান আর তাচ্ছিল্য, তথাপি কিছুই তাঁকে হতোদ্যোম করতে পারেনি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ডিরোজিও করে গেছেন নাগাড়ে সংগ্রাম।

সেই সময়ে অনেক ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন ভারতবর্ষে- যাদের ফিরিঙ্গি বলা হতো। বাবা ফ্রান্সিস ডিরোজিও ছিলেন সেই ফিরিঙ্গি সমাজের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা। কাজ করতেন 'জে স্কট এন্ড কোম্পানি'তে। মা সোফিয়া ছিলেন গৃহিণী। মাত্র ছয় বছর বয়সে মা-হারা হন ডিরোজিও। ডিরোজিওর বাবা পরবর্তীতে আনা মারিয়া নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করেন। এই মারিয়ার হাতেই লালিত-পালিত হয়ে উঠেন ডিরোজিও।

সেই মা হারানোর বছরই, অর্থাৎ ছয় বছর বয়সে ডিরোজিওকে ভর্তি করা হয় ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা একাডেমি স্কুলে। ১৮১৫ থেকে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ, এই আট বছর ধরে ডিরোজিও পড়াশোনা করেছিলেন এই স্কুলে। এবং এখানেই, ড্রামণ্ডের হাত ধরে গড়ে উঠেছিল ডিরোজিওর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ। এই বিদ্যালয় পড়াকালীন সময়ে ডিরোজিওর মধ্যে গড়ে ওঠে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ভাষা, সংস্কৃতি তথা সমাজ সংস্কারের প্রতি আবেদন বা আকর্ষণ। যা পরবর্তী জীবনে হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের পাথেয়।

আগেই বলা হয়েছে বাংলার নবজাগরণ প্রসার লাভ করে দুটি ধারায়। একটি ধারার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং ওপর ধারার নেতৃত্ব দিয়েছেন হেনরি ডিরোজিও। এই দুটি ধারার মধ্যে মূলানুগ পার্থক্য ছিল আধ্যাত্মবাদ এবং বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ।

রামমোহন রায় দীর্ঘ পনেরো বছর (১৮১৫-৩০) হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সাথে আধ্যাত্মিক বিতর্ক করে হিন্দুদের বহুঈশ্বরবাদ ও খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদকে পরাভূত করে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদ। সূচনা করেন হিন্দু নারীমুক্তির জন্য সুদীর্ঘ শতাব্দীকালের সংগ্রাম। যার ফলস্বরূপ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে আইন করে বিলুপ্ত করা হয় হিন্দু নারীর সহমরণ, অর্থাৎ সতীদাহ প্রথা। এছাড়া আরোও অনেক সংস্কার আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন রাজা রামমোহন।

কিন্তু ডিরোজিওর নেতৃত্বে যে নব্যবঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়, তা ছিল যুক্তিভিত্তিক মুক্তচিন্তার স্বপক্ষে পরিচালিত ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন। হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার সময় ডিরোজিও পড়াতেন ইতিহাস ও সাহিত্য। তিনি তাঁর প্রায় ডজনখানেক অনুসারীকে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তানুশীলনে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। এদেরকে সাথে নিয়ে তিনি গঠন করেন 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে একটি সংগঠন।

মাত্র সতেরো বছর বয়সে ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজের (আজকের প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের) শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি পান, তখনই তাঁর মধ্যে অনেকেই দেখেছিলেন এক সুপ্ত অগ্নিশিখা। পরবর্তী সময়ে যা জ্বলে উঠেছিল দীপ্ত আলোকরশ্মি হয়ে। গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে এক অপূর্ব ধারায় শিক্ষকতা করতেন ডিরোজিও। প্রথাবিরোধীভাবে ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তার সমবয়সী, কেউ কেউ আবার বয়সে বড়।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধব চন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, অমৃতলাল মিত্র, রাধানাথ শিকদার- এইসব কৃতি ছাত্ররাই ছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর প্রাথমিক ভিত্তি এবং পরবর্তীকালে বাংলায় মুক্তচিন্তা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রীবৃন্দ। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তৎকালীন হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কার ও পারম্পরিক সংকীর্ণ চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করে গড়ে তুলেছিলেন নবজাগরণের অন্যতম প্রহরী করে।

শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিও শিক্ষাদানকে কখনো ক্লাস রুমের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। ক্লাসের বাইরেও নানা জায়গায় তিনি মিলিত হতেন শিষ্যদের সাথে। ছাত্রদের কাছে এক কথায় তিনি ছিলেন ফ্রেন্ড, ফিলোসফার এবং গাইড। নানা ধরনের প্রতিযোগিতা, বিতর্কসভা যেমন আয়োজনের ব্যবস্থা করতেন, তেমনি তিনি ছাত্রদের উৎসাহ যোগাতেন পত্রিকা পরিচালনার। পরিণতিতে তাঁরই ছাত্রদের মাধ্যমে পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় 'দ্যা এনকোয়ার' 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকা। এই সব পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো বাংলার নব্য যুবকদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলো। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ সমাজ প্রমাদ গুনতে শুরু করলেন। ফলে নব্য বঙ্গ (ইয়ং বেঙ্গল)-দের সাথে সংঘাত হয়ে উঠেছিল অনিবার্য।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে, আলেকজান্ডার ডাফ আয়োজিত বক্তৃতামালার প্রথম অধিবেশনের পর থেকেই হিন্দু সমাজে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয়। হিন্দু কলেজের বহু অভিভাবক কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে শুরু করলেন যে তিনি ছাত্রদের বিপথগামী করছেন। অনেক অভিভাবক কলেজ থেকে সন্তানদের নাম কাটাতে শুরু করলেন।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল কলেজ পরিচালনা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিরোজিও শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করছেন- এই অভিযোগ তুলে তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্তের দাবি তোলা হলেও সমিতির সকল সদস্য একমত হতে পারেননি। কিন্তু তার অব্যবহিত পরই, ২৫ এপ্রিল ডিরোজিও নিজেই পদত্যাগপত্র তুলে দেন কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে।

অধ্যাপনার কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে এবার মুক্তাঙ্গনে অব্যাহত রইল ডিরোজিওর জীবনসংগ্রাম। 'ইস্ট ইন্ডিয়া' সম্পাদনা করেই যাচ্ছিলেন, সেই সাথে অন্যান্য কাগজেও তিনি নিয়মিত লিখে যাচ্ছিলেন ধর্মান্ধতা আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। এবার কলম ধরতে শুরু করলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও। চাকুরী হারিয়ে পত্রিকার ব্যয় বহন করা তাঁর পক্ষে হয়ে উঠেছিল দুরূহ। এক সময় এক এক করে বিক্রি করতে শুরু করলেন লাইব্রেরীর বইপত্র। শেষ পর্যন্ত ঘরের দামি আসবাব পত্র সমূহ। এমনি করে শেষ জীবনে তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল নিদারুণ অর্থাভাব আর অনটনের।

সেই ১৮৩১ই ছিল ডিরোজিওর জীবনের অন্তিম বছর। ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ তিনি আক্রান্ত হন কলেরায়। ২৬ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কলকাতার সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেট্রিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ডিরোজিও জীবনে সময় পেয়েছিলেন খুবই কম। এই স্বল্প পরিসরে তিনি বাঙালির চিন্তা-চেতনার জগতে আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। দাসত্ব, অমানবিকতা, নানাধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বাঁধন শৃঙ্খলা ইত্যাদির বিরুদ্ধে মনুষ্যত্ববোধ এবং স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করে গড়ে তুলেছিলেন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং মানবহিতৈষণার অপূর্ব নবজাগরণ। সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ডিরোজিও ঔপনিবেশিক অবগুণ্ঠনের মাঝেও তাঁর প্রজ্ঞা এবং প্রতিভার মাধ্যমে তৈরি করেছিলেন মানবমুক্তির এক অনন্য দিশা নির্দেশনা।

ফরাসি বিপ্লবের তিনটি মূল ধারা সাম্য, স্বাধীনতা এবং মুক্তি- এই ত্রিবিধ মৌল সত্যের ভরপুর প্রভাব পড়েছিল ডিরোজিওর মধ্যে। এই তিন মৌল সত্যের আঁধারেই গড়ে উঠেছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের গভীরতা। যার প্রভাবে বৃহত্তর বাঙলা এবং ক্রমান্বয়ে দেশব্যাপী পরিব্যপ্ত হয়ে উঠেছিল এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সামাজিক পরিমণ্ডল। তাঁর সততা, সত্যনিষ্ঠা এবং সত্যানুসন্ধিৎসা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল দেশের যুবসমাজকে।

ইউরোপে যেমন সাংস্কৃতিক সামাজিক অচলায়তন ভেঙে দেয়ার ক্ষেত্রে ভাষ্যকারের ভূমিকা পালন করেছিলেন কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও এবং তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য রাসোলিনাস ও এ্যাবেলার্ড, ঠিক তেমনি বাঙালির নবজাগরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

আগেই যেমন বলা হয়েছে, বাংলায় নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল রাজা রামমোহনের হাত ধরে এবং তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্য দিয়ে। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে নবজাগরণের বীজ বপন করেছিলেন, ডিরোজিওর সমাজ পরিবর্তনের ধারণার মাধ্যমে তার ব্যাপক সাড়া পড়েছিল তরুণ সমাজের মধ্যে। ডিরোজিও তরুণদের উজ্জীবিত করেছিলেন মুক্তচিন্তার মাধ্যমে প্রশ্ন তুলে ধরতে এবং অন্ধভাবে সবকিছুকে গ্রহণ না করতে। ডিরোজিওর এই বৌদ্ধিক বিপ্লবকে পরবর্তীতে যারা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম মাইকেল মধুসূদন-দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বলা হয় বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি। শুধুমাত্র বাংলা সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তকই নয়, তাঁর 'মেঘনাথবধ কাব্য' ছিল তৎকালীন সমাজের কাছে এক অনন্য প্রতিবাদী কাব্যশৈলীর উদগীরণ। মাইকেলের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে সংযোজিত হয় নবজাগরণের এক প্রাকৃত ধারা।

ঠিক তেমনি কাজী নজরুল ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার। নবজাগরণের পেছনে কাজী নজরুলের রয়েছে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা। তাঁর সময়কালে সাহিত্যকর্মের এক বৈপ্লবিক সংযোজন ঘটে। তাঁর কবিতায় প্রবল বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। সকল প্রকার অপশাসন অত্যাচার আর সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে নজরুল ছিলেন সোচ্চার প্রতিবাদী- 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' !

পরিশেষে যার কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি, তিনি উপমহাদেশে কোন প্রকার পরিচয়ের মুখোপেক্ষী নন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, চিত্রকর, গল্পকার, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। বাংলা ভাষার সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর মাধ্যমেই বাংলার নবজাগরণ পরিপূর্ণতা লাভ করে। বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি মননে সাধিত হয় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

মোটকথা, ব্রিটিশ রাজত্বকালে অবিভক্ত বাংলায় যে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার আরম্ভ হয়েছিল, তা পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল বহু কৃতি মনীষীর আবির্ভাব এবং কর্মের মাধ্যমে। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যে নবজাগরণের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তার শেষ ধরা হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও কর্মের মধ্য দিয়ে। যদিও পরবর্তীতে অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষ এই সৃজনশীলতা এবং শিক্ষা-দীক্ষার বিকাশের বিভিন্ন ধারার ধারক ও বাহক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। ঊনবিংশ শতকের বাংলা ছিল সমাজ সংস্কার, ধর্মীয় দর্শনচিন্তা, সাহিত্য-সাংবাদিকতা, দেশপ্রেম ও বিজ্ঞানের পথিকৃৎ। বাংলার আলোকে আলোকিত হয়ে পরবর্তীতে মধ্যযুগের অন্য ঘটিয়ে এদেশে সূচনা হয় আধুনিক যুগের।

(C) Ishan K